

তারানাথ তাত্ত্বিকের গল্প বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হইবার দেরী নাই। রাত্তায় পুরনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে, এখানে কি ? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোননি ? মন্ত বড় শুণী।

হাত দেখানোর খৌক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি ? যা বলে তা সত্য হয় ? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে ? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে ? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইন বোর্ডে লেখা আছে—

তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়। গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি। আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন। বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে।

দশনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বললাম—লোকটা বোগাস্। এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত তার এই বাড়ি ?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়িতেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে ?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষীমশায় বাড়ি আছেন ?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোনো উন্নত শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন ?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ করে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে।

আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভিতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্ষপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঢেলিয়া একজন বৃন্দ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃন্দের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথার চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তা-ব্যঙ্গক। চোখ দুটি বড় বড়, উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লড় রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে। কেবল লড় রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিষ্কৃট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃন্দ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনেরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনেরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মাসে বিয়ে তো হয় না, আপনার হ'ল কেমন ক'রে এরকম তো দেখিনি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিনটা মনে ছিল এইজন্য যে, আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটা গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তবে তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক বিজ খেলার আড়তায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথাবার্তার কোনো অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃন্দ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মন্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন

আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুন্দ
মানিব্যাগটা খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই।
তারানাথ বোধহয় থট-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া
বলিতেছে? এটুকু বোধহয় ধাপ্তা। যাই হোক, সাধারণ হাতদেখা গণকের মতো
মন বুঝে শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর
আমার শুন্দি হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যাইতাম
তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড়তা দিতে।

লোকটার বড় অঙ্গুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে
বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী
ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধন করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা
পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদণ্ড ক্ষমতা
ভাঙ্গাইয়া থাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোরদৌড়, ফাট্কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা
দেখাইয়া শীঘ্ৰই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়াৱীর মোটৰ গাড়ির
ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু
করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি
পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়, নারী ও সুরা। এই
তিনি দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আভৃতি দিয়া
পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ তো সামান্য গণৎকার ব্রাক্ষণমাত্র। প্রথম
কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে
তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে
ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার পস্তা নষ্ট হইল।
তবু ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনোটিরই অভাব
তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ
হয়েছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই
তারানাথের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা
কই?

আমার মতো গুণমুক্ত ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই,
একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া
আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে, তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে
রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাইনি

এতকাল যে তাকে কিছু দিই ।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও ? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব । দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃক্ষাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে উয়ে থাক । কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে । চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে । ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর নিচে একটা গাছের তলায় দুটি পরী । তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে । ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না ।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম । লোকটা এমন সব অন্তুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা তো যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কও নাই । পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তার তো কোনোদিন জানা ছিল না ।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি । তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—‘চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন, দেখা করে আসি । খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি ।’ তারানাথের স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে ।

গেলাম বেলেঘাটা । সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোনো একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে ঝুমাল আছে ? বার করে দেখ ।

ঝুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে । আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-হয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, ঝুমালখানাতে আমার নামও লেখা সুতরাং—হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই ।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিকশক্তির সাহায্যেই আমার ঝুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবু এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোনো মূল্য দিই না । আতর তো বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায় ।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিষ্পত্তিশীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে ।

তাই বা পায় কি করিয়া ? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও তো অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মূহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার ঝুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও তো একটা প্রকাণ বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে contact at a distance—এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো । যদি ধরি হিপ্নটিজ্ম, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার

উপর তত্ক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহা সান্ধি হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপনটিজমের প্রভাব অঙ্গ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও তো আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আচর্য হয়ে পড়লে, তবু তো সত্যিকার তাত্ত্বিক দেখনি। নিম্নশ্রেণীর তত্ত্ব এক ধরনের জানু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাকম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তাত্ত্বিক দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তত্ত্বচর্চার শক্তি, ব্ল্যাকম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অন্তর্ভুক্ত শক্তির তাত্ত্বিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশ বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুঁড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম— চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামতো নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম—সব দিন ঘটে উঠ্টে না, হণ্টার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাসতিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিক্লিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিটখানেক ছিল প্রথম দিন।

এইভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না। ঠাকুরমার বাস্তু ভেঙ্গে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাস্তীয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়নি, মন্দিরে আরতি চলেছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমঙ্গলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু তো কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন— বাবাজীর বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম, বাঁকুড়া জেলায় মালিয়াড়া-রঞ্জপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রঞ্জপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ একটু যেন অন্যমনক্ষ হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রঞ্জপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ি-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম তো কখনও শুনিনি! সন্ন্যাসীকে সঙ্গমে সে কথা বলতে তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু! তুমি জানবে কি ক'রে! খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে তো?

খেয়াঘাট! রঞ্জপুরে নদীই নেই, যজে গিয়েছে কোন্ কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবু পুরনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলবৃত্ত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোনো পূর্বপুরুষ, ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিশ্঵য়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু মেহময় বৃন্দ পিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরণ, অবোধ পৌত্রের কোনো ছেলেমানুষির কথার জন্য। সত্য বলছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারিনি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষ হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সম্মেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস্ কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বললেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম কিছু করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নে। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয়নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বললুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি করে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোনো কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাহোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম। খানিক দূরে গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্?

আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সম্মেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোনো লাভ হবে না।

তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্ দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃক্ষ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোনো হিন্দি মেলাতে পারলুম না। সান্ন্যালদের বাড়ির ছেলে-ছেকরার দল তো কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেসন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বললেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা থাতা দেখেছি, তাতে আমার বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিঙ্গ ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেননি। অন্তত দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্তা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্বোত্ত ছিল। বড় বড় কিণ্টি চলত। কোনো নৌকা একবার ওই মন্দিরের নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙ্গার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙ্গার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল তো, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ না কি?

ওদের কাছে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোনো অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শূশানে এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড়

তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শূশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়-চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে ?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার উপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি।

আঙুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শূশান, ভয় হ'ল ওর মৃত্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—
পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার
পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি ?

বললাম, মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাঠি। বললে—ফের যদি আসিস্ তবে
বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। এ
এক পাগলের পাল্লায় পড়ে থ্রাণ্টা যাবে দেখছি কোন্দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে
চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখে আমায় যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে
না রে ? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার
গেলাম। ওমা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে। পাগলী আমায় দেখে মারমৃত্তি হয়ে শূশানের
একখানা পোড়াকাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরীয়া হয়েছি,
বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে ? তুমিই তো
আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল—তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর
মুণ্ড চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অন্তুতভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি
বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান
করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির বলে
টানছে।

হঠাতে সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন

খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্তৃর মতো—তার সে হকুম পালন না ক'রে যে
উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে বিরক্ত করিস্ বল্ তো? তোর দ্বারা কি হবে,
কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই
থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন
এসেছিস, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার? বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতুহল হ'ল। এর আগে
লোকের মুখে শনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে।
কলকাতার গঙ্গবাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য
ব'লে মনে হয়নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান
কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শুশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা
পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি তো অবাক! ইতস্তত করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি
এরক রকম অসম্বন্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ তো দেখছি পুরো পাগল, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর
কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর
ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা
থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্বি, বিশ্বাদ চিতার কয়লার টুকরো
মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল করে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে
এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বন্ধ উন্নাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা
সাধু বলে নাম রাখিয়েছে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিন্দুপের সুরে বললে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা?
পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছে শুশানে আমার কাছে? দূর হ
জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও
কেউ মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখান থেকে
উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে
স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসিহাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্
নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত
অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে
না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন। বললে— আবার

এসেছিস দেখছি । আচ্ছা নাহোড়বান্দা তো তুই ?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে ? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল । এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি ?

পাগলী বললে—পারবি তুই ? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি ? বললাম—আছে । যা বলবে তাই করব । দেখই না পরীক্ষা ক'রে । সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে । সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল । গলা টিপে মেরে ফেল । তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে । নিয়ম ব'লে দেব । বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয় । আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা । মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিংকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা দিবি । তোর রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে । রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি । যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয় । কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না । ভয় পেলে সাধনা তো মিথ্যে হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার । কেমন গাড়ী ?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুবাতে পারি নি । কথা শনে তো অবাক হয়ে গেলাম । বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না । আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন ?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে । ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ । আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাঝি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে । বললাম—রাগ করছ কেন ? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা ? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে ?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্র লোকের ছেলে । ভদ্র লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, ও অলঞ্চেয়ে ঘাটের মড়া ? তত্ত্ব-মন্ত্রের সাধনা ভদ্র লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কৰ গিয়ে—বেরো—

বললাম—তুমি শুধু রাগই কর । পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা তো ভাবছ না । আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঢেকাবে কে ?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বন্ধ উন্নাদ । এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না ।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুন্দি সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তত্ত্বের কথা শুনেছি । সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয় ।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল । বিকেলে যখন গেলাম,

তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'ল আর জ্ঞান থাকে না, তোকেও
ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা
করতে চাস্ নি। ও সব নিন্ম-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতকগুলো শক্তি লাভ
হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি তাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম
জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লৈ
চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী
আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না।
তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ
ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন
বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা
যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই।
কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ,
তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর
মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক
অবস্থাও এই কথার উপযুক্ত বটে। গ্রাম শূশান, একটা বড় তেতুলগাছ আর এক
দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর
একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনোদিকে লোকজন নেই।
অঙ্গাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অন্তু ধরনের কথা !

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্র তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি
ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই
তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন
প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি
দুঃসাহস, এমন তাঙ্কিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই
ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে
নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুবিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজেস করলাম—তুমি তাহ'লে
হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুবালাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে
না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে।
বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর

মধ্য এমন শক্তি আছে, আপনার একেবারে সর্বনাশ করে দিতে পারে। ওকে
বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক
মারা পড়বেন শেষে ?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না
গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সঙ্গের পরে
পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর
সেই বটতলায় গিয়ে হঠাতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের
গুড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার
তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপ্সা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই তো! এ আবার কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজেস করলাম, মা, তিনি কোথায়
গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

— সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক’রে হেসে বলল—আ মরণ, কে তার নামটাই বল
না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই তো! সেই হাসি, সেই কথা বলবার
ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত
আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী
বালিকা।

মেয়েটি হেসে ঢ’লে পড়ে আর কি। বললে—এসো না, ব’স না এসে পাশে—
লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এসো—

হঠাতে আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব’লে মনে
হ'ল না— তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোনো বিপদে
ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কর্তৃর ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম,
দেখি বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব
না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এসো, ব’স।

বললাম—তুমি ও রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা
কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোনো ভয় দেখিও না। যখন তোমায় যা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরীয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোক ছিলাম না কোনো কালেই, তবু কখনও মড়ার উপর ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সঙ্ক্ষের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চূপি চূপি এসো।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়নো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ঘোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন্ ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধহয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হাল্কা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না; অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে তো? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ঘোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোনো তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সঙ্ক্ষে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সঙ্ক্ষের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র

আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোনো বিভাবিকা দেখ, তবে তয় পেয়ো না। তয় পেলেই ঘরবে।—তখনও আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শূশান, কেউ কোনো দিকে নেই, নীরক্ষ অন্ধকার দিগবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাতে এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক তো কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শূশানে একটা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে কোনো স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে আমার মনে হ'ল শূশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, দুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চারপাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্রা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। দু-পায়ে গঞ্জির ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই বল! হরি হরি ! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষ হয় নি—পরক্ষণে আমার চারপাশে মেয়েগলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।.... আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অঙ্ককারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনোটার মাথার খুলি ফুটো, কোনোটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেবে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই

ছেড়ে দেবে, অমনি কক্ষালগুলো হড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙ্গচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তুপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ শূশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমায় গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে ? যা হোক, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না ?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের তো শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইন.....বললাম-আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন....আমার জীবন ধন্য হ'ল—

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন ?

—আজ্ঞে, আমি তো জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি তখন তোমার আর কিছুতে দরকার নেই। তুমি মহাডামরী বৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা... তুমি তয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন ?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে ?

আমার মনে হ'ল, এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।....যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামরীকে চেন না ? আমাকেও চেন না ? তা হ'লে আর চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ ? দিব্যোঘ পথের নাম শোন নি তন্ত্রে ? পাষণ্ডলনের জন্যে ঐ পথে আমরা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্র দিব্যোঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড ?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্পদায় রক্ষার জন্যে....অত ভয় কিসের !

ত্রুটি না তোকে লাথি মেরেছি ? শূশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি। তোকে
পর্যবেক্ষণ না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে ?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি ?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়,
সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

—ঠিক কথা দিলি ?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার
নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল !

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোনো তফাত নেই।
একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্কি ?

আমি কথার কোনো উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার
মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি ? আপনি
কি সেই শূশানের পাগলীও না কি ?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অঙ্ককার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে
গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকক্ষাল হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকেবেঁকে
উদ্বাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে
লাগল। কোনো কক্ষালের হাত খসে গেল, কোনোটার মেরুদণ্ড, কোনোটার
কপালের হাড়, কোনোটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবু তাদের নৃত্য সমানেই
চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস
ঠক ঠক শব্দ !

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গেল কাগজের মতো, আর
সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুখালু বেশে নেমে
আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল,
বিশ্রী মড়া পচার দুর্গক্ষে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো
রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে !
শেয়ালের চিৎকার ও নরকক্ষালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি
সব জগৎ নিষ্ঠুর, সৃষ্টি নিরুম !

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে
আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জুলন্ত দুচোখ ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ
মেশানো, সে কি ভীষণ ক্রূর দৃষ্টি! সে পৃতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন
রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই
তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিন্কার করে কেঁদে বললে—
আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয়—আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে
ব'লে আমার গতি হয় নি—আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শূশানে।
ছাপ্নানু বছর.... কাকেই বা বলি ? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশেহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে
ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে
সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে... সেই বটতলায় আমি আর
পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি
না ?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা
বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ
ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনায় বাধা। তুই ষোড়শীকে
চিনিস না, শ্রীষ্ঠোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মক্ষণ্ডি।

‘এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষ্ঠোড়শী সুন্দরী।’

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা! তুই
তার জানিস্কি ? ওসব মায়া।

আমি সন্দিপ্তসুরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক
বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না ; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি
একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল— কি সেটা ?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে
দেখেছিস্কি, তিনি মহাভামুরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি
নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন ?

তারপরে সে হঠাত হি হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর
কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস
করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কাবরার করি। ওরে অলঞ্চেয়ে, তোকে ভেঙ্গি
দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায়
গিয়েছিলি তুই ? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে
এলি ? এই তো সবে সঙ্গ্যে— !

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা

হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল—ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকফাল, ষোড়শী, উড়ত চিলশকুনির ঝাঁক—সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে ? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে ?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয়, তত্ত্বের সাধনা। তুই আর কোনোদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি তো অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেঙ্গি নিয়ে থাক কেন ? উচ্চতত্ত্বের সাধনা কর না কেন ?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্ম এমনি কেটেছে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাইনি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনোদিন।

তখন আমি চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শূশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত— তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝবে ? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও ? এসো চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়লাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাতত চন্দ্রদর্শন অপেক্ষা গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

